প্রসঙ্গ বিজনদা

কুমার রায়

কোনো কৃতি মানুষের কথা লিখতে গেলে তাঁর নামের বর্ণমালার পাশে বন্ধনীর মধ্যে তাঁর জন্ম সাল এবং মৃত্যুর সালটি উল্লেখ করার রীতি চলে আসছে। আজ নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭ - ১৯৭৮) সম্পর্কে লিখতে বসে সেটা মনে করেই বন্ধনীর মধ্যে সেইটেই লিখতে হলো। জন্ম সালটি লেখার সঙ্গে একটা কথাই মনে পড়ল – রুশ বিপ্লব, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তি। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর সৃষ্ট নাটকে এই বঞ্চিত মানুষদের কথাই লিখে গেলেন। রুশ বিপ্লব যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা নতুন বোধের জন্ম দিয়েছিল— পৃথিবী কাঁপানো সে ঘটনা— তেমনি বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম সালটি – তাঁর নাট্যকার জীবনের প্রতিষ্ঠা যে নাটক দিয়ে সেই 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকটি বাংলা থিয়েটারে একটা নতুন জীবন সঞ্চারী নাটক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। 'এসেছে' শব্দটি একটু অতীত ঘেঁসা হয়ে গেল। বস্তুত তাই-ই। বাংলা থিয়েটারে নবান্ন নাটক এবং তার প্রযোজনাটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। নাটক নিয়ে মানুষ অন্য রকম ভাবতে শিখেছেন। রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বকে ভাবিয়েছিল — নতুন পথ দেখিয়েছিল সারা বিশ্বকে। নিপীড়িত মানুষ নতুন দিশা পেয়েছিল। কোনোওভাবেই ব্যপ্তির দিক থেকে তুলনীয় নয়, তবু 'নবান্ন' নাটকও তার প্রযোজনা বাঙালী নাট্যচিন্তার প্রেক্ষিতে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিল। বাংলা নাট্য সাহিত্য এবং নাট্যভিনয়ে এক একটা নতুন যুগ এনেছিল। আর এর মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিল বাংলার নাট্য চিন্তকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনেরাও। বাস্তবকে না চিনলে সাহিত্য শিল্পে নাটকে সমাজ বাস্তবতার ছোঁয়া আসবে কী করে? একথা ঠিক রাজনৈতিক একটা তাগিদ ছিল এসময়ে নাট্যরচনার পশ্চাদচিন্তায়। তখন দর্শক, নটনটী, নাট্যকার মিলে যে এক যজ্ঞানুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিল। উদ্বোধিত নাট্যকার, উদ্বোধিত নাট্যশিল্পী উদ্বোধিত দর্শক। একটা প্রত্যাশা জাগানোর মতো কাজ। নাটক নতুন, অভিনয় নতুন, চিন্তা ও প্রযোজনা শৈলীও নতুন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, –দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিজন ভট্টাচার্য তখন সাংবাদিক জীবন শুরু করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা তখন তাঁর কর্মস্থান। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরীতে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে 'অরণি' পত্রিকায় বিজন ভট্টাচার্যের লেখা একাঙ্ক নাটক 'আগুন' (১৯৪৩) প্রকাশিত হয়েছে। এটিই কি বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক? পরের দুটি নাটক যে জবানবন্দী (৪৩) ও নবান্ন (৪৪) সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর কোনোও এক সাক্ষাৎকারে 'আগুন' নাটকের আগে রচিত একটি নাটকের হদিশ আমরা পাই। সেটি মৌলিক নয়–রাজশেখর বসুর একটি গল্পের নাট্যরূপ। বিজন ভট্টাচার্য তখন যাদবপুরে যক্ষ্মা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন। কুড়ি একুশ বছরের অসুস্থ এক যুবক তিনি। আরও দুটি যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত যুবক যুবতীও সেখানে ভর্তি ছিলো। তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু তখনকার বিশ্বাসে এ রোগ তো দুরারোগ্য। কাজেই তাদের মিলিত জীবনের আকাঙ্খা কোনোওদিনই পূরণ হবার নয়—তাই তারা দুইজন হাসপাতালের সংলগ্ন পুষ্করিনীতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। বিজনদার নাট্যকাহিনি এদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল — তাঁর লেখা নাটকটিতে। বিজন ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে বলেন— 'This gave me a rude shock. Then a thought arose out of salvation which I tried to break through theatre.'

এই সংবেদী মন নিয়েই বিজন ভট্টাচার্যের সমগ্র নাট্যচর্চা।

আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাস 'নবান্ন'র পালে হাওয়া লাগিয়েই শুরু হয়। এটি যেন স্বীকৃত রীতি। গ্রাম বাংলার পরিবেশে তিনি অল্পবয়স থেকে কাটিয়েছেন। আর সেই সূত্রেই দরিদ্র কৃষককুলকে তিনি চিনে নিয়েছিলেন। শুধু কৃষিজীবী না, গ্রামের কারুজীবী, গায়ক, কীর্তনিয়া, বাউল তিনি চিনতেন জানতেন। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী' লেখক শিল্পি গোষ্ঠী 'দরবেশ লেখক শিল্পী সংঘ' এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর এই জীবনমুখী শিল্পী সত্তাকে প্রভাবিত করেছিল সে আমলে। সক্রিয়ও ছিলেন। সংযোগ রক্ষাও করে চলেছিলেন বেশ কিছুকাল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে আমার সহপাঠি বন্ধু ঋত্বিক ঘটকের মাধ্যমে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ঋত্বিকের আত্মীয়তার বন্ধন তার সঙ্গে আমারও সূত্রটা পরিচয়ের মাধ্যমে গাঁথা হয়ে গেল। বিজন ভট্টাচার্য হলেন বিজনদা। তার কিছুদিন আগে 'নবান্ন' প্রযোজনার, আর এক স্রষ্টা শম্ভু মিত্রর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন এই ঋত্বিক ঘটকই।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং বিজনদা বম্বে চলে যান। চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন — একটি গীতিনাট্য। 'জীয়নকন্যা' (৪৫) সে সঙ্গে লিখলেন 'অবরোধ' (৪৬-৪৭), মরাচাঁদ (একাঙ্ক/৪৬) নাটক। গ্রামীণ কৃষি জীবনের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের গভীর সম্পর্ক। শুধু কৃষক নয়, সমস্ত গ্রাম্য জীবনই তাঁর জানা ছিল গভীর ভাবে। লোকায়ত জীবনের চাওয়া পাওয়া, কামনা বাসনা, সংস্কার, আচারনীতি, পূজাপদ্ধতি, অধ্যাত্ম, চেতনা, লোকসংগীত সবই যেন বিজনদার করতলগত। 'দেবীগর্জন' (৬৬), মরাচাঁদ (পূর্ণাঙ্গ/৬০) 'গর্ভবতী জননী' (৬৯) তাঁকে শক্তিশালী নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল এবং নিজে এইসব নাটকের শক্তিশালী অভিনেতাও।

অধিকাংশ তাঁর রচিত নাটকে বাংলার গ্রাম জীবনের চিত্র অঙ্কিত করতে প্রেরণা দিয়েছে। মার্ক্সিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে দিয়েছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা জীবন সংগ্রামের আলেখ্য রচনায়, কিন্তু কখনোই তাঁর সৃজনশীল রচনায় তা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি। ঠিক একই কারণে, তাঁর নাট্যরচনায় চিরাচরিত বাংলা নাট্যরচনার রীতিকেও অস্বীকার করতে চেয়েছে। ইউরোপিয়ান যে রীতি তা তিনি ভেঙ্গেছেন। তাঁর নাট্যরীতিতে আবার প্রচলিত যাত্রার উপস্থাপনা বা সংস্কৃত নাট্যরীতিও মানেন নি। বাংলার সীমানায় তাঁর গ্রাম জীবন আদিবাসী জীবন চিত্রায়িত হয়েছে। গভীর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের প্রত্যেক পর্বেই তাঁর নাটক ও সংলাপের গঠনে গ্রামীণ চিত্র বর্তমান কিন্তু বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে বিজনদার নাটকে ভাষার চটুলতা দেখা দেয় রীতি ও নিয়ম ভেঙ্গেই। কিন্তু ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দকে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর নাটকে। এই ভাষার নিজস্ব নাটকীয় গুণ আছে। মনস্তত্বের বিশ্লেষণে নিখুঁত না হলেও তার নাটকের চরিত্ররা জীবন্ত হয়েই ফুটে উঠেছে আপন শক্তিতে। হয়তো এই গঠন এবং একান্তই আঞ্চলিক প্রভাব— তাঁর

নাটককে সর্বভারতীয় অন্যভাষায় অনুবাদ হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। বিজনদা একান্ত ভাবেই বাঙলার নাট্যকার হয়ে থেকে গেলেন। 'গোত্রান্তর' (৫৬) এবং 'আজ বসন্ত' (৭০) নাটকে অন্যধারায় রচিত ব্যতিক্রমি নাটক। দেশভাগের পর মধ্যবিত্ত সমাজের যে অংশ ছিন্নমূল হয়ে এসেছিল এ দেশে তাদের শ্রেণিবিচ্যুতি নিয়ে লেখা এ নাটক। এবং আজ বসন্তও প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ জীবনের নিঃসঙ্গতা নিয়ে শহুরে চরিত্র চিত্রন।

নিবন্ধে ইতিমধ্যে উল্লেখিত নাট্যগুলি ছাড়াও বিজনদার নাট্যরচনার তালিকাও বেশ দীর্ঘ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অবরোধ' (৪৬-৪৭), কলঙ্ক (৫০-৫১), জননেতা (৫০), জতুগৃহ (৫১), ছায়াপথ (৬১), মাস্টারমশাই, ধর্মগোলা (৬৭), কৃষ্ণপক্ষ (৬৬), সানিগগ (৬৮), স্বর্ণকুম্ভ (৭০), লাস ঘুউর‍্যা যাউক (৭০), সোনার বাংলা (৭১), গুপ্তধন (৭২), চলো সাগরে (৭০-৭৭), চুল্লী (৭২), হাঁসখালির হাস (৭০-৭৭)।

বিজনদা মূলত নাট্যকার কিন্তু তিনি গীতিকার, প্রাবন্ধিক এবং ছোটো গল্পকার ও ঔপন্যাসিকও। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানত কম্যুনিস্ট পার্টি ও আই.পি.টি - এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে পার্টি ও সংঘ ছেড়ে দিলেও মার্কসবাদে স্থিত ছিলেন —যদিও কোনোও অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে থাকেননি। মার্ক্সইজিম তাঁকে প্রাণিত করেছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু অন্ধতা ছিল না। প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্য তাঁকে মর্যাদাও দিয়েছে আবার বিচ্ছিন্নও করেছে। মাঝে মাঝেই তিনি একা হয়ে যেতে চাইতেন। 'জীয়নকন্যা' গীতিনাট্যটি এবং 'অবরোধ' এই দুই নাটিকা সম্পর্কে সে সময়ের পার্টির মনোভাব — এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজনদা জানিয়েছিলেন 'জীয়নকন্যা' নাট্যের রচনার উদ্দেশ্য— ''১৯৪৫ -এ দেশভাগের আশংকায় 'জীয়নকন্যা' লিখি। 'ক্যালাস' দেশনেতা ও 'ক্যালাস' সরকারের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ।" সুধী প্রধান আবার বলেছেন, —'কিন্তু 'জীয়নকন্যা'য় শেষ পর্যন্ত শ্রেণিচেতনাহীন ও সংগ্রামহীন ঐক্যের আবেদন, নানা সুর বৈচিত্র্যে পূর্ণ হলেও সামগ্রিভাবে সহানুভূতি ও চিন্তাকে জাগ্রত করতে পারেনি।' —অর্থাৎ ফর্মুলা সিদ্ধ হয়নি আবার 'অবরোধ' নাটকটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রচিত। এটিও গণনাট্যসংঘ প্রযোজনা করেনি —কারণস্বরূপ সুধী প্রধান লিখেছিলেন 'কারণ দুটি। একটি বিজনের কারখানা ও পুঁজিবাদ ক্রিয়াকলাপ প্রভৃত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এবং দ্বিতীয় 'জনযুদ্ধ'র রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন তখন যে ভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যকার বিরোধের কৌশলগত রূপকে বুঝতে না পারা।' নাট্য সাহিত্যের গুণাগুণ সে আমলে এই সব ফর্মুলায় বাঁধা ছকে বিবেচিত হত। বিজনদার মুক্ত মন গুরুত্ব পায়নি। সাহিত্যের বিচার এই ভাবেই তখন করা হতো। বিজনদা আপন অন্তরের প্রেরণাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'আগুন', 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন' —এই তিনটি প্রথম পর্বের নাটক ছাড়া 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' পতাকাতলে বিজন ভট্টাচার্যের কোনোও নাটকই হয়নি। এই ঘটনাটা স্মরণে রাখা ভালো। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর নিজের দল 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই তাঁর একাঙ্ক নাটক 'কলঙ্ক', 'মরাচাঁদ', 'ছায়াপথ', 'মাস্টার মশাই', 'গোত্রান্তর', 'দেবীগর্জন' 'গর্ভবতী জননী', জলাসত্ত্ব ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাটকগুলি অভিনীত হয়েছে ই. বি. আর. ম্যানসন ইনস্টিটিউট্, নিউএম্পায়ার, মিনার্ভা, মুক্তাঙ্গন, আকাদেমী মঞ্চে।

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন দল গড়লেন —'কবচকুণ্ডল'। সেখানে প্রথম নাটক কৃষ্ণপক্ষ (রবীন্দ্রসদন) আজ বসন্ত (ঐ) চলো সাগরে (তপন থিয়েটার), মরাচাঁদ (পূর্ণাঙ্গ), এই মরাচাঁদ নাটকের অভিনয় তাঁর জীবনের শেষ অভিনয়। শেষ সন্ধ্যায় এই নাটকে অভিনয় করে সেই রাত্রেই বিজনদার মৃত্যু হয় জানুয়ারি ১৯ তারিখে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ৬০ বছরের জীবনের অবসান ঘটল। নিজে নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যাভিনয়ের শিক্ষক, গীতিকার পরিচালক, নাট্যভাবুক মানুষটি অভিনয় করতে করতে চলে গেলেন মাটির মায়া ত্যাগ করে। যে মাটি, যে মাটির মানুষ এবং সেই ভূমিচাষী মানুষদের সান্নিধ্যে তার নাট্যকার জীবনের প্রধান পাথেয় হয়ে ওঠে — এবং সেখানে তিনি অকপট। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার খানপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন (ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য) কর্মসূত্রে তিনি সাতক্ষীরা, বসিরহাট, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন। সেই সুবাদে গ্রামের মানুষ তাদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিজনদার মধ্যে সঞ্চিতই ছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ সবটাই তাঁর নাট্যজীবনের গোড়াপত্তনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল। সেই মন্বন্তর, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা এবং নীতিহীনতা সমগ্র সমাজ জীবনকে তখন গ্রাস করেছে। তার প্রতিক্রিয়া বিজনদার সৃজনশীল মনে প্রবল অভিঘাত তৈরি করে — তার প্রকাশই তাঁর নাটকে আমরা দেখবো। বাংলা নাটকের পথ বদলে যে দিশা 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা দিয়েছিল সেটা আজ ইতিহাস। তা কিন্তু অনুসৃত হলো না। গভীর আলোড়ন আন্দোলন যাই বলা হোক, তা পঁচিশ - ত্রিশ বছরেই যেন বিস্মৃত হয়ে গেল।

এই নিবন্ধের শুরুতে রুশ বিপ্লব এবং সোভিয়েত দেশ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলাম — বিজন ভট্টাচার্যর জন্মসাল উল্লেখ সূত্রে। সেই সোভিয়েত দেশ ৭৫ বছরে ভেঙে গেল — সে ঘটনার প্রভাব কেমন স্মিমিত হয়ে গেল হয়তো ইতিহাসে ঠাঁই পেয়ে তা অতীতের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে থেকে যাবে। তেমনি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বা অন্যসব আলোড়ন তোলা নাট্যসমষ্টির প্রভাব আর থাকবে না — শুধু ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তিই যেন এদের নিয়তি। এ যুগের নাটকে ছেলে মেয়েরা কি অনুপ্রাণিত হয় বিজন ভট্টাচার্যের নাটক থেকে? ঘভীর সন্দেহ হয়। অথচ বিজনদা ঃ এই পায়ে চলার শ্রম স্বীকার করে নিয়েই আজকের বাংলা থিয়েটার সমাজের আধুনিক কালে প্রবেশ করেছে বাংলা নাট্যসাহিত্যও। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা শিখেছে। পথে না চললে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় না ঘটলে — পথের ধূলা পায়ে না মাখলে, চলতে চলতে পারিপার্শ্বকে না চিনলে তো বাস্তব কে চেনা যায় না। আর বাস্তব না চিনলে সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে সমাজবাস্তবতার চেহারা আসবে কি করে?

সমাজতত্ত্বেও যাকে 'সামাজিক মন' বলে— তা কালপ্রবাহে এবং গণতান্ত্রিকতার সূত্রে গণ্ডির বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এ কথা ঠিক— তাই বিজনদার নাট্যবোধ ও নাট্যরচনার শৈলী যুগের প্রভাবেই হয়তো প্রসারিত হবে — হয়তো — অন্যরকম হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হয়তো। সব দেশেই কথাটা সত্য। এ কালের সুবিধায় সব জায়গায় একটা কথা শোনা যাচ্ছে —বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যশৈলী, নাট্যভাবনারও নাকি এমন কোনো দাম পাবে না কেননা মানুষ ক্রমশই অরাজনৈতিক হয়ে যাচ্ছে। মতাদর্শের অবমূল্যায়নের এটা ভাল দিক কিনা জানিনা। কিন্তু কারণ যাইহোক না কেন — এটা বোঝা যায়, যে বিজন ভট্টাচার্য একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়েই থেকে গেলেন। যন্ত্রণা বিদ্ধ বিজনদাকে দেখেছি — কিন্তু বিশ্বাসহারা অবস্থা দেখিনি। মুখে যাই বলুন, কিন্তু নাটকের মধ্যে প্রোথিত বিশ্বাসের আলো স্তিমিত হয়নি। বিজনদাকে যদি কখনো বিভ্রান্ত দেখিয়ে থাকে– তা সে বিভ্রান্তি সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি নয় – শিল্পীর বিভ্রান্তি! সে বিভ্রান্তির নিরসন শিল্পীকেই করতে হয় তার কাজের মধ্য দিয়ে। বিজনদা সেই কাজটা করে গেছেন — খোঁজার কাজ।

বিগত শতকের নব্বই -এর দশকের শুরুতে আমরা বহুরূপীতে একবার 'নবান্ন' নাটকটির পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছিলাম, তখন অনুভবে এসেছিল এর বৈশিষ্ট্য এবং আজকের দিনে গ্রহনীয়তার কথাটাও ভাবনায় এসেছিল। তাই নাটকটিকে সাজাতে হয়েছিল—অতীতের একটি ঘটনা হিসেবেই —তাই সেই সময়ের গান (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র নবজীবনের গান) চিত্ত প্রসাদ জয়নুল আবেদিন সাহেবের উড্‌কাঠের ছবি এবং দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলি ব্যবহার করা হলো মানুষকে সেই দুর্বিষহ দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই। কিছু সম্পাদনাও করা হয়েছিল নাটকের এবং নাট্যাভিনয়ের দিন কিছু ছবিও তৈরি করার প্রয়াস ছিল। পারিবারিক কাহিনি হিসেবেই শুরু হয় নাটক— সমস্ত নাটকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য দিয়ে সাজান — কিন্তু বিজনদার রচনার গুণে নাটক একটা সমগ্র সমাজচিত্র হয়ে ওঠে। এই গুণটা নাটকের মধ্যেই ছিল। আমরা সেটা বের করে আনবার চেষ্টাটাই করেছিলাম আমাদের প্রযোজনায়। আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল — 'নবান্ন' একটা আলো — অনেক দূরবর্তী একটা আলো। সেই আলোর দিকে তাকালে একটা মনের জোর আসে। চলতে চলতে ফিরে ফিরে তাকাতে হয় — মনের জোর পাওয়ার জন্য। সেই সার্থকতাটুকু 'নবান্ন'-র এখনো আছে।

এবার এ নিবন্ধ শেষ করবো আমার মনে গেঁথে থাকা বিজনদার নাটকে বিজনদার সৃষ্টি তিনটি চরিত্রের অভিনয় অবিস্মরণীয় সে অভিজ্ঞতা।

'প্রধান', 'পবন' ও 'প্রভঞ্জন' —এই তিনটি চরিত্র বিজনদার অভিনয় জীবনের তিনটি স্মরনীয় অধ্যায়। শুধুমাত্র একটি বাংলা বর্ণের অনুপ্রাসের জন্য এর হালকা চমক নয়। এই তিনটি চরিত্রের আধার বিজনদার লেখা তিনটি নাটক— 'নবান্ন' 'মরাচাঁদ' এবং 'দেবীগর্জন'। প্রথম, মধ্য এবং শেষ জীবনের ফসল এই তিনটি নাটকের তিনটি চরিত্র অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের ক্ষমতার মূল্যায়ন। এই অভিনয়ের জন্য সেই ভাবনাটাকে ধরা যায়—চেনা যায়।

সেই আমলে বলা হয়েছিল — 'আত্ম পরিচয় লাভ করতে হলে, শিল্পকে মেলাতে হবে দেশের প্রাণের সঙ্গে, জাতির অবচেতন স্তর থেকে খুঁজে আনতে হবে আবেগ আর অনুভূতিগুলিকে', —এই বোধ —বোধকরি বিজন ভট্টাচার্যই একমাত্র নাট্যকার সে আমলে তার সমগ্র কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই বোধের কাছে তিনি দায়বদ্ধ থেকে গেছেন।

বিজনদা তাঁর নাটকের মধ্যে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে চেয়েছেন একটা আবেদন সৃষ্টি কররতে। নিজের বিশিষ্টতা প্রকাশ করাতে সেই সঙ্গে সেই প্রাথমিক অঙ্গীকার পূরণ করতে। বাংলাদেশের মানুষের অবচেতনের ঐতিহ্যের যে মৌল উপাদান আছে তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তাঁর লেখা নাটকে – তার চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে; চেয়েছেন গ্রামীন মানুষের দুঃখ যন্ত্রণাকে বুক পেতে গ্রহণ করে তাকে নাট্যে এবং অভিনয়ে রূপায়িত করতে। বিজনদা বিশ্বাস করেছিলেন —যে মিথ্ তিনি তাঁর নাটকে ব্যবহার করবেন তা থাকা চাই জাতির অবচেতনের তলায়। পূর্বপুরুষ শানিত বিশ্বাসে। 'নবান্নের' অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, ক্রমবিবর্তিত হয়েই দেবীগর্জন' -এ এসে পৌঁছেছিলেন— চিন্তাশীল আবেগী, সক্রিয় এবং সচেতন নাট্যকার। শেষে এসে পূর্ণাঙ্গ করলেন 'মরাচাঁদ' নাটকে অন্ধ বাউল চাষী পবন এর চরিত্র চিত্রায়ণে। এ তাঁর যোগ্য উত্তরণ।

নবান্ন এক দুঃখের নাট্য, বেদনার ইতিহাস, সে ইতিহাস, সে বেদনা এই বাংলার। সেই বাংলারই এক চাষী প্রধান সমাদ্দার। সম্পন্ন চাষী— দুর্ভিক্ষ বন্যায় সর্বস্ব হারিয়ে কলকাতার ফুটপাতে আস্তানা গড়ল। তারপর কতো স্বজন হারিয়ে কতো ধকল সহ্য করে ঐ সব মানুষ গাঁয়ে ফিরবে ওই সব ঘর ছাড়া গ্রাম ছাড়া মানুষ— সেখানে মাঠে সযত্নে, বন্যার পরের পলিমাটিতে ধান উঠছে— হবে 'নবান্ন' উৎসব সেই নতুন ধানে। নবান্ন একেবারে আম বাংলার পাঁচিল এক বিশেষ সময়ের। গ্রামের কেন্দ্রে মানুষ প্রধান, কেন্দ্রচ্যুত ভিখিরী মানুষ প্রধান, অধ্যায়ের বদ্ধ মানুষ প্রধান — এই তিনটি দিক যাকে থ্রি ডায়মেন্‌শনাল এক চরিত্র এই প্রধান সম্মাদার। এক ম্যাজিক তো নয় সে চরিত্র। অনেক আলো ছায়া, অনেক বড়ো কৃতিত্ব এই প্রধান সমাদ্দার চরিত্র চিত্রণে। 'নবান্ন' নাটকে কলকাতায় চিকিৎসা কেন্দ্রে যখন প্রায় উন্মাদ প্রধান সমাদ্দার রুপী বিজন ভট্টাচার্য বলতেন — 'ভুলে যাও তোমার ব্যাথার কথা, ব্যাথার কতা ভুলে যাও' —এতো শুধু সংলাপ নয়, এক মহৎ কথাও নয়— কথা নয় বলা যায় এ এক বাণী।

'দেবীগর্জন' নাটকে 'প্রভঞ্জন' চরিত্রে বিজনদার অভিনয় সম্পূর্ণ অন্য এক মাত্রা যোগ করল। অত্যাচারী এএক জোতদার মজুতদার পিশাচ চরিত্র। রূপসজ্জায় বাচনে অন্য এক মানুষ— শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয় —কিন্তু কি আশ্চর্য এক ঠাণ্ডা টোনের মূর্তিমান শয়তান এক চরিত্র! যখন দরিদ্র গ্রামের চাষীদের সামনে তাদের দেওয়া খত্‌টি— তাদের চোখের সামনে দোলাতে দোলাতে দেখাতেন — মনে হতো এ কাল নাগিনী সাপ যেন হিস্ হিস্ শব্দ করে ফনা তুলে দুলছে। শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয় বাংলার শক্তিপূজার প্রতীক দেবীরই আবির্ভাবে। সম্পূর্ণতা প্রতীক এ দেবীর গর্জন — বঞ্চিত মানুষেরই উত্থানের প্রতীক। কিন্তু বড়োই দেশজ এবং স্বাভাবিক এ জাগরণের এ প্রতিমা।

'বাংলাদেশে আয়েন গায়েন ফকির বোষ্টম পেট ভরে খেয়েছে কোন্ কালে!' —একথা লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তিনিই লিখলেন 'মরচাঁদ'। উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত দোতারা বাজিয়ে টগর অধিকারীর জীবন ইতিহাস এই মরাচাঁদ নাটক। বিজনদার সৃষ্টি মরাচাঁদের অন্ধ চাষী বাউল 'পবন' চরিত্রটি অনবদ্য সৃষ্টি। সে গাঁজা টানে সেটা সত্য — সে গান গায় সেটাও সত্যি। এও সত্যি যে একদিন তার প্রাণের রাধার বিশ্বাসঘাতকতায় বলে বসে— ''মোর গান শেষ হয়ে গেছে।'' বিজনদাও ব্যক্তিজীবনে মাঝে মধ্যে থেমেছেন— কিন্তু তাঁর রচিত পবনের অপমৃত্যু দেখবার নতুন জীবনের গান তার গলায় তান তোলে। পবনের প্রতি এক বুকময় মমত্ববোধ ছিল বিজনদার। শিল্পের শুদ্ধতায় টিকে থাকার অটল প্রতিজ্ঞার যন্ত্রণা। বিজনদা তাঁর এই নাটকের অপর চরিত্র কেতক দাসের বা বলা ভালো আজকের সমাজের কেতক দাসদের —দাস হতে চাননি। প্রধান (নবান্ন) -এর মতো এই পবন চরিত্রও এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মরাচাঁদ নাটকে কেতক দাসের চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন বিজনদা। ''দলকুশী ছেড়ে কালোবরণ নিরুপায় হয়ে তেওড়া, দাদরা, বাজাতে লাগল। কিন্তু, অর্ডার হয়েছে কেতক দাসের। বল্লে বলে দাদা কি করবো — পেট, পেট তো চালাতে হবে!'' —বিজনদা এই তেওড়া, দাদরা তাঁর নাট্য জীবনে বাজাতে চাননি। বিশ্বাসে শুদ্ধতাই বজায় রেখে গেছেন তিনি।

প্রধান - পবন - প্রভঞ্জন ভীষণ বাস্তব চরিত্র, ভীষণ সত্য। আজ যে মুহূর্তে 'সত্য' কথাটা উচ্চারণ করছি তখন বাস্তব ছাড়িয়ে মিথ্যা এক সত্যের জগতে প্রতীক হয়ে দেখা দিচ্ছে চরিত্রগুলি এই তিন চরিত্রের আধার তিনটি নাটকও খাঁটি সত্য। বিজনদার নাটকে চিরকালের স্তব্ধতা — আছে কিনা জানিনা। কিন্তু চলতি কালের চাঞ্চল্য— যে নেই সেটা বুঝতে পারি।